নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃঃ ৯৩-১১২
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মো. জফির উদ্দিন*

সিলেটের জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত

প্রাক-কথন

কোনো জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার-বিবেচনা করে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়ের পরিধি উদ্ঘাটিত হতে পারে। প্রাচীন বঙ্গভূমির সর্বাংশে যে সমাজ-সভ্যতা সমধারায় বিকশিত হয়নি উত্তরকালেও তার নিদর্শন থেকে যায় বহুমাত্রিক অভিধায়। সুদূর অতীতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুদ্রা, লোকনিরুক্তি, সাহিত্যকীর্তি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং সর্বোপরি ভাষিক সূত্রেও তার সন্ধান মেলে। ভূ-প্রকৃতি এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ জন-সমীকরণের বিশিষ্ট উৎপাদ হিসাবেও অবশ্যই কার্যকর হয়। আদি-বঙ্গের সর্বত্র হয়তো একই অভিঘাতে এর সব কিছু ঘটে নি, কিন্তু অঞ্চল-ভিত্তিতে তার স্থায়ী প্রকাশ এই পলিমণ্ডিত ভূভাগকে অত্যল্প পরিসীমার মধ্যেও এনে দিয়েছে বিশিষ্ট কিছু আঞ্চলিক অনন্যতা। এমনি বিশিষ্ট কতিপয় বঙ্গীয় অঞ্চল রাঢ়, পদ্মা-মেঘনা বিধৌত মধ্য-বঙ্গ, সাগর-মেখলা ভূতল-গিরি মালার চট্টগ্রাম এবং গাঙ্গেয় সমভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চল বরাক-সুরমা উপত্যকার সিলেট।

প্রাচীন বঙ্গভূমির অংশ-বিশেষ ভারত-আর্য সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসেবে প্রাচীন কালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল সিলেট ভূমি। সুদূর অতীতের আর্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক ও মোঙ্গলীয় ইত্যাদি জনতাত্ত্বিক সংমিশ্রণ সিলেটের বৃহত্তর আঞ্চলিক সংস্কৃতির ধারণাটি নির্দেশ করে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক গঠনানুসারে অঞ্চলটি প্রাচীনকালেই আন্তর্জাতিক সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও গঠিত হয়। উপর্যুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিধেয় পর্যবেক্ষণ করা যায়।

সাধারণ পটভূমি

প্রাচীন শ্রীহট্ট বা সিরহট, সিলহট এবং অধুনা সিলেট ভূখণ্ডটি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত। পাহাড় ও অববাহিকা বেষ্টিত সিলেটের অবস্থিতি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। এর উত্তরে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে ভারতের কাছাড় পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই ও ত্রিপুরা পাহাড় এবং পশ্চিমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা। বাংলার সমতল ভূমির অধিকাংশই সমুদ্রগর্ভ-পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সিলেটের কোনো

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সিলেট, বাংলাদেশ।
ই-মেইলঃ zafirsetu@yahoo.com

কোনো অঞ্চলও অতি প্রাচীনকালে বৃহৎ হ্রদ বা সাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রিক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুযায়ী তখনকার দিনে সমুদ্র *পাটলিপুত্র* থেকে তিনশ মাইল দূরে ছিল। হিমালয় পর্বতের পদতলে সামুদ্রিক মৎস্যের অস্থি আবিষ্কারে অনুমিত হয় যে বাংলার অধিকাংশ ভূমি এককালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। কিন্তু সিলেটের প্রায় অর্ধাংশ বা তদুর্ধ্ব ভূমি অতি প্রাচীন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ-অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল (আলম, শামসুল ১৯৮৩: ৫২)। সিলেটের উত্তর-পূর্বাংশ এবং পূর্ব-দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন। উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রাচীন কালের জনবসতির চিহ্ন, বিকশিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আভাস এসব অঞ্চলেই পাওয়া গেছে।

সিলেটের অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন এমন যে, সম্পূর্ণ বাইরের উৎস থেকে আগত নিয়ামক ও বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অঞ্চলটি প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প প্রবণতা, আকস্মিক দুর্যোগ, নগ্নীভবন (Denudation) এবং নদীজ ভূমিরূপগত কার্যপ্রণালী।[১] বস্তুত সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থান, পাহাড় ও সমভূমির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থিতির ধরন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিশেষত্ব এবং কৃষিজ অনুশীলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েই জনবসতি ও জনঅভিবাসনসহ অতীতের এবং সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশ লাভ করেছে।

সিলেটের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেখা যায়, একসময় সিলেট প্রাচীন কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল, যদিও ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের তথা কামরূপ অন্তর্গত প্রাচীন সিলেটের ইতিহাস আজও তমসাচ্ছন্ন।[২] প্রাপ্ত লিপিসাক্ষ্য থেকে এটুকুই জানা যায় যে, প্রাচীন সিলেট বর্মণ রাজবংশের সময়ে কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (চৌধুরী, মুস্তাকিম ১৯৯৭: ৩২)।[৩]

সিলেট প্রাচীন হরিকেল রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কান্তিদেবের তাম্রশাসনে[৪] হরিকেলকে *মণ্ডল* হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।[৫] আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত *আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট*, ও *হরিকেল* তিনটি স্ব-স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত *রুদ্রাক্ষ মাহাত্য*(ত্ম্য) এবং *রূপচিন্তামণিকোষ* (*রূপচিন্তামণিকোষ*, পঞ্চদশ শতক) নামক দুটি পাণ্ডুলিপিতে *শ্রীহট্ট* ও *হারিকোলা* নামক জনপদ দুটিকে এক এবং সমার্থক বলা হয়েছে (রায় ২০০৩: ১১২)। এইসব সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে মনে হয় হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হতে দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। ... এ-হিসেবে হরিকেল বা হরিকোলা যে শ্রীহট্ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা স্বীকার করতে আপত্তি থাকার কারণ নেই (রায় ২০০৩: ১১২)।

পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাল বংশের প্রায় সমসাময়িক যুগে সিলেটে চন্দ্রবংশীয় শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীচন্দ্রের শাসনকাল উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছে।[৬] এই সময়ে বহুসংখ্যক বহিরাগতের আগমনও ঘটে। গোবিন্দচন্দ্রই (রাজত্বকাল আনু. ১০২০-১০৪৫) চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা।[৭] সুতরাং বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে সিলেট বিভিন্ন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় সামন্তশাসকদের অধীনে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল হিসেবে এবং প্রশাসনিক কেন্দ্র বা রাজধানীতে অবস্থানকারী শাসকদের পরোক্ষ শাসনাধীনে ছিল। ভাটেরা

তাম্রশাসন অনুযায়ী অনুমান করা যায়, স্থানীয় সামন্ত শাসকরা ক্রমে ক্ষমতা সঞ্চয় করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে শ্রীহট্টরাজ্য সৃষ্টি করে।[৮] প্রাচীন শ্রীহট্টের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, এ-অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বাঙালি অভিবাসন। কেবল লোকনাথ, ভাস্করবর্মণ এবং শ্রীচন্দ্রের শাসনামলেই নয়, শ্রীহট্টে আরও অনেক অজ্ঞাতনামা প্রশাসকের শাসনামলে বাঙালি অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালালের সহযোগিতায় সিকান্দার খান গাজির মাধ্যমে সিলেট সর্ব প্রথম মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয় (করিম ১৯৯৩: ১৪১)। সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজশাহের মৃত্যুর পর সিলেট সোনারগাঁ *ইকতার*[৯] সঙ্গে যুক্ত হয়। সুলতানি আমলের অল্পকাল ছাড়া সব সময়ই সিলেট স্বাধীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট মুঘল শাসনাধীনে চলে আসে। কিন্তু আকবরের সময় সিলেট মুঘল শাসনাধীনে ছিল না। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হলে তাঁকে আওরঙ্গজেব অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সিলেটেরও ফৌজদার নিযুক্ত করেন (ইসলাম, সিরাজুল ১৯৯৩ ক: ৬৭)। ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট মহাম্মদ শাহ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার সুজাউদ্দিনের নিকট অর্পণ করলে তিনি এই তিন অঞ্চলকে চারটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন। সিলেট পড়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার সাথে। ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে আলিবর্দি খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে একই শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক বিভাগ অব্যাহত রাখেন (ইসলাম, সিরাজুল ১৯৯৩ ক: ৪১)। ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুর দিকে ভারতের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পরগনা, সরকার ও জেলাকে সমন্বিত করে একটি District বা জেলা প্রশাসন নামক প্রশাসনিক ইউনিট প্রতিষ্ঠা করলে সিলেট তাতে স্বতন্ত্র ভুক্তি পায় এবং ব্রহ্মযুদ্ধে আসাম উপত্যকা কোম্পানির অধিকারে চলে আসার পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির করায়ত্ত হয় (জব্বার ১৯৭০: ৫১)। কোম্পানির শাসনের অবসানের পর প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীনে প্রায় ১৬ বছর সিলেট বাংলার ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১০] ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলাকে বাংলার ঢাকা বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিফ কমিশনার শাসিত নবগঠিত আসাম প্রদেশের সাথে যুক্ত করা হয়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গের সময় তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বিধাবিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে যে-নতুন প্রদেশ গঠিত হয় তাতে সিলেট আসামের সাথেই থেকে যায়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হলে আসাম পুনরায় চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে রূপান্তরিত হয় এবং ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিলেট আসামের একটি জেলারূপে গণ্য হয় (আজিজ ২০০৬: ২৪)। ১৯৪৭ সালের এক গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে ভুক্তি হলেও রেডক্লিফ রোয়েদাদের বদৌলতে সিলেট তথা বরাক-সুরমা উপত্যকার চারটি থানা করিমগঞ্জ, বদরপুর, পাথার কান্দি ও রাতারবাড়ি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাই আজও রাষ্ট্রিক সীমানা পেরিয়ে সুরমাপারের মানুষের সঙ্গে আসামের বরাকপারের মানুষের ভৌগোলিক, ভাষিক-সাংস্কৃতিক এবং আত্মীয়তা ও রক্তের বন্ধন নিবিড়।

সিলেটের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল ; সিলেটেদের জনগোষ্ঠীর বেলায় তা জটিলতর। তবে সিলেটিদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঙ্গে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নৃগোষ্ঠীগত ক্ষেত্রেও এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য-- ভাষিক সম্পর্ক তো বলাই বাহুল্য।[১১] সিলেটের যারা বর্তমান অধিবাসী তাদের পূর্বপুরুষদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি, কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বঙ্গীয়-অঞ্চলের কোনো জনগোষ্ঠীরই নৃতাত্ত্বিক পরিমিতি নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে বাঙালি রক্তসংকর জাতি এবং এদেশে রক্তসাংকর্য এত বেশি হয়েছে যে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও হয়তো তার নির্ভুল তথ্য পাওয়া ভার।[১২] অনুমানিত তেরো শতকে সংকলিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ বাঙালিদের বর্ণভেদ প্রসঙ্গে ছত্রিশ জাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই বিভাজনটি নিশ্চয়ই নৃতাত্ত্বিক নয়-বৃত্তি সম্পৃক্ত সমাজভিত্তিক (শরীফ ২০০৪: ৪)। স্যার হার্বার্ট রিজলি[১৩] এক সময় প্রচার করেছিলেন যে, বাঙালিরা দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতি। কিন্তু এই মত অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। এখন নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে নানান গোষ্ঠীর মানুষ বঙ্গভূমিতে বসবাস করে আসলেও তাদের মধ্যে আদি-অস্ট্রেলীয় বা Proto-Astralaid গোষ্ঠীর মানুষের প্রধান্য ছিল বেশি (রায় ২০০৩: ৩১)। তবে তাদের সঙ্গে মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ থাকাটা সম্ভব। বিশেষ করে খাসিয়াদের মধ্যে মোঙ্গলীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। নৃতত্ত্ব ও ভাষা গবেষণায় এটা অনুমিত যে প্রাচীন বঙ্গবাসী বলতে মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল, ভূমিজ, শবর প্রভৃতিদের বোঝায়; এমনকি বোঝায় মালয় ও আসামের আদিম বাসিন্দাদের, এবং দ্রাবিড়দের ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আদি অধিবাসীদের (ভট্টাচার্য, সুভাষ ২০০০: ১৪)। এখন সিলেটি জ্ঞাতি পরিচয়ে, বাংলার পূর্বাঞ্চলের সমগ্র বাংলাভাষী এলাকা জুড়ে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁদের সঙ্গে সিলেটের মানুষের দৈহিক গঠনের যে-অভিন্নতা লক্ষণীয়, তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতেই পারে যে সাধারণ বাঙালি জাতির মধ্যে যে-সব নৃগোষ্ঠীয় প্রভাব বিদ্যমান, এই অঞ্চলের সে-প্রভাব কার্যকর ছিল। এ-প্রসঙ্গে বাঙালি জাতির উৎস পরিচয় প্রাসঙ্গিক। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় নীহাররঞ্জন রায়ের সিদ্ধান্তটি এখানে উদ্ধৃত করা যায়:

> ... সুদীর্ঘ জাতিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। সেটি এই: নরতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার জনসমষ্টি মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাসা আদি-অস্ট্রেলীয় বা 'কোলিড্' দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেনালিড্', এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব ব্রাকিড', এই তিন জনের (*জন* শব্দটি *Race* এর প্রতিশব্দ অর্থে-গবেষক) সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরের এবং সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ স্থানগণ্ডির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি নর্ডিক বা খাঁটি 'ইণ্ডিড্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা অত্যন্ত শীর্ণ ও ক্ষীণ। মোটামুটিভাবে ইহাই বাঙলাভাষাভাষী জন-সৌধের চেহারা,

> এবং এই জন-সৌধের উপরই বাঙালির ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লইয়াই বাঙলার ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত। (রায় ২০০৩: ৩৬)

উপরোক্ত নৃতাত্ত্বিক জাতির মধ্যে শ্রীহট্ট (ও কাছাড়) অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কাদের প্রভাব বেশি, সে সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়: উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর মোঙ্গলীয় প্রভাব একটু বেশি পড়েছিল। অন্তত নীহাররঞ্জনের বক্তব্যে তা-ই প্রমাণ করে। তাছাড়া শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চল যেহেতু বাংলাভাষী ভূখণ্ডের পূর্ব-প্রত্যন্তে অবস্থিত, সুতরাং এখানে সে প্রভাব যে একটু পড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না (চৌধুরী, সুজিৎ ১৯৯২: ১০)। সিলেটি তথা বাঙালি জনজাতির জ্ঞাতি পরিচয় প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা অবশ্য বিশেষ সাংস্কৃতিক ধারার জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব অনুমান করেছেন। এ-প্রসঙ্গে সুজিৎ চৌধুরীর বক্তব্য নিম্নরূপ:

> ...আদি অস্ট্রেলীয়রা 'অস্ট্রিক' সংস্কৃতির সঙ্গে, মিশর-এশীয় বা মেলানিডরা দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সঙ্গে, অ্যালপাইনরা যজ্ঞ-বিবর্জিত, ব্রাত্য আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে, মঙ্গোলীয়রা ভোটব্রহ্ম সংস্কৃতির সঙ্গে এবং আদি নর্ডিকরা আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। (চৌধুরী, সুজিৎ ১৯৯২: ১০)

অবশ্য, সুপ্রাচীনকালেই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঙ্গে বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। অনেকে আবার নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ধরে রেখে বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে এমনটা পণ্ডিতদের অনুমান।[১৪] আবার প্রাচীনকালে সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠার যে-স্বতঃসিদ্ধ ধারণা তা এর ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-সাংস্কৃতিক ইতিহাসই প্রমাণ করে। কিন্তু এই বসতি স্থাপনকারী আদিম জনগোষ্ঠী কারা ছিল সে-সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবেচনা উল্লেখযোগ্য:

> ভারতে তথা বাঙলায় মানুষের বাস প্রথমটায় ছিলই না। বাইরে থেকে ভারতের অধিবাসীদের পূর্ব-পুরুষরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে আরম্ভ করে, স্মরণাতীতকাল থেকে-প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। প্রথম আসে আফ্রিকা থেকে নিগ্রোজাতীয় মানুষ। আফ্রিকার পরে আরবদেশ আর ইরানের সাগরকূল ধ'রে এরা দক্ষিণ বেলুচিস্থান হ'য়ে ভারতে আসে। বাঙলা দেশেও এদের আগমন হয়, কিন্তু পরবর্তীকালের মানুষ, যারা আসে তাদের হাতে এরা বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। বাঙলা হ'য়ে আসাম, তারপরে বর্মা, বর্মা থেকে ডাঙ্গার রাস্তায় মালয়দেশ, আর ডোঙ্গা করে সাগর পেরিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ- এইসব দেশে নিগ্রোজাতীয় মানুষের প্রসার হয়, কিন্তু বাঙলায় এদের আর অস্তিত্ব নেই। তারপরে আসে নিষাদজাতীয় মানুষ, যাদের ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পরিভাষায় Austric বা Austro-Asiatic বলে। এদের ভাষা এখন পরিবর্তিত আকারে কোল, খাসিয়া আর নিকোবারীদের ভাষা বলে বিদ্যমান- মুণ্ডারী, সাঁওতালী, হো, কুরকুঁ, গদব, শবর প্রভৃতি ভাষা যারা বলে তারা এদের সাক্ষাৎ বংশধর। সারা বাঙলা জুড়ে এদের বাস ছিল। এখন যারা এদের মধ্যে বনে পাহাড়ে গিয়ে আছে তারাই নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছে, আর বাকি সব বাঙলাদেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে মিলে গিয়েছে। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১: ২৮-২৯)[১৫]

আবার ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিচার-বিশ্লেষণ করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্য একটি গবেষণায়[১৬] মোঙ্গলয়েড বা ভারতীয় মোঙ্গলীয়দের একটি শক্তিশালী শাখা

হিসেবে *বোডো* ভাষাভাষী জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতি বিজ্ঞানীও ডিমাসা, টিপরা, মেচ, হাজং, কোচ, রাভা প্রভৃতি ইন্দো-মোঙ্গলীয়দের সাধারণ নাম হিসেবে *বোডো* শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। ইন্দো-মোঙ্গলীয় বোডোদের প্রসঙ্গে সুনীতিকুমারের মন্তব্যটি নিম্নরূপ:

> One may say that the Bodos, who spread over the whole of the Brahmaputra valley and North Bengal as well as East Bengal, forming a salid bloc in North-eastern India, were the most important Indo-Mongoloid people in Eastern India and they form one of the main bases of the present-day population of these tracts. ...south of the Garo hills they spread in northern Mymensing, where the semi-Benglised Hajong tribe is of Bodo origin. From nowgong district in Assam there area of occupation extented to Cachar district and into sylhet, and from cachar and Sylhet they moved further to the south, to Tripura state ...and from Tripura they spread into comilla and possibly also Noakhali district: and thus they occupied the mouths of the Ganges by estern sea. With the exception of the isolated khasi and jaintia Hills, the Whole of Assam and North and East Bengal were the country of the great Bodo people. (Chatterji 1974: 45-46)

সুতরাং পূর্ব বাংলার অন্য অধিবাসীদের যেমন, তেমনই শ্রীহট্ট-কাছাড়ের মানুষের মধ্যেও ইন্দো-মোঙ্গলয়েড প্রভাব একটু বেশি। এমনকি বাংলা ভাষার এই অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপটির মধ্যেও বোডো প্রভাব বিদ্যমান। সিলেট ও কাছাড়ের বিভিন্ন স্থাননাম, যেমন-কুলাউড়া, লাতু, লাউতা, ঘুঙ, হিঙ্গাজিয়া, খাদিয়া, বাড়াউড়া, লংলা, লেংগুড়া, টেংরা, করঙ্গি, খোয়াই, সুতাং, কুই, লুবা, বুরুঙ্গা, রেঙ্গা, চানবরং, লাউয়াই, হাকালুকি, সংগাই, সিংগেরকাচ, লাতু, জাঙ্গাইল প্রভৃতির বেলায়ও একই মন্তব্য করা যায়।[১৭] কিন্তু পরবর্তীকালে বোডো জাতির মধ্যে আর্যভাষার প্রসার ঘটে বহিরাগত আর্যভাষীদের আগমনের ফলে। এবং বোডোরা কালক্রমে আর্যীকরণের প্রক্রিয়ায় ঢুকে পড়ে। মৌলভীবাজারের ভাটেরায় যে তাম্রশাসন[১৮] পাওয়া গেছে, তাতেও শাসনকর্তা হিসেবে আর্যীকৃত বোডোদের পরিচয় নিহিত আছে।[১৯] তাই বলে *বোডো* বা *ইন্দো-মোঙ্গলীয়*রাই যে সুরমা-বরাক উপত্যকার প্রাচীনতম বাসিন্দা, তাও কিন্তু নয়। নীহাররঞ্জন থেকে জানা যায় যে, ইন্দো-মোঙ্গলীয়দের প্রবেশের বেশ আগেই প্রোটো-অস্ট্রোলয়েডরা পূর্ব ভারতে বিচরণশীল ছিল। এদের সংস্কৃতি, যাকে আমরা *অস্ট্রিক* বলে অভিহিত করি, তা বাংলাভাষী বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর পেছনে বেশ সক্রিয়ভাবে ক্রিয়াশীল। আবার শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে আদি-অস্ট্রেলীয় জাতির প্রাচীনতার কোনো প্রমাণ কোথাও নেই। কিন্তু তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতির ধারক এক বা একাধিক জনগোষ্ঠী যে এই অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছিল বোডোদের এখানে প্রবেশের আগেই, তা অনুমানের যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্তমান। সমতলীয় এ-উপত্যকার সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলে যে-খাসি-সিন্টেং জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে বাস করে আসছে, তাদের

অস্তিত্বই এ-অনুমানের সুযোগ করে দিচ্ছে। ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিচারে খাসি জনজাতি এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত জনজাতিই তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক গঠন এবং আদি ভাষা দুটোই একই সঙ্গে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সমস্ত জনজাতীয় গোষ্ঠীই নৃতাত্ত্বিক বিচারে মোঙ্গলয়েড এবং ভাষিক পরিচয়েও তারা ভোট-ব্রহ্মগোষ্ঠীর অন্তর্গত। খাসিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটেছে। নৃতাত্ত্বিক ও দেহ গঠনের বিচারে তারা *মোঙ্গলয়েড* আর ভাষিক পরিচয়ে *অস্ট্রিক* (চৌধুরী, সুজিৎ ১৯৯২: ১৪)। সুনীতিকুমারের অনুমান, খাসিরা ছিল একটি দলছুট মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী, বোডোদের বৃহৎ জনপ্রবাহ এই অঞ্চলে প্রবেশের বহু আগেই তারা বিচ্ছিন্নভাবে এখানে প্রবেশ করেছিল। এবং তখন তারা সংস্পর্শে আসে পূর্বাগত অস্ট্রিকভাষীদের, যারা বহু আগে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিশেষ জোর দিলেও বাস্তব প্রয়োজনে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। সুনীতিকুমারের বর্ণনায়:

> It is equaliy likely that they were a congeries of diverse Tibeto-Burman speakers inthe Khasi and Jaintia Hills and in the plains of Sylhet, setting among original Austric-speakers, whose language the Tibeto-Burman setters in this area found convenient to adopt when their own tribal dialects were to numerous and too diverse. Probably this linguistic changeover occurred before the coming of the waves of Bodo expansion. Their lingustic uinqueness they have preserved among the surrounding Tibeto-Burmans (Bodos) and Aryan-speakers (Bengali and Assamese). (Chatterji 1974: 45-46)

কিন্তু আদি-অস্ট্রেলীয় দেহ বৈশিষ্ট্যসহ কোনো জনজাতীয় গোষ্ঠী যারা ছিলেন তারা খুব সম্ভব সমতলীয় সমাজের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন, স্বতন্ত্রভাবে তাদের আর চিহ্নিত করা সম্ভব নয়; পূর্ব-প্রান্তবর্তী সুরমা-বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে কথাটা আপেক্ষিক সত্য মাত্র। সুতরাং এতটুকু অনুমান করা সম্ভব যে, প্রাচীন শ্রীহট্ট-কাছাড়ের আদিমতম অধিবাসী ছিল অস্ট্রিকভাষীরা, নৃতাত্ত্বিক বিচারে তারা হয়তো আদি-অস্ট্রেলীয় বা এদের দ্বারা প্রভাবিত অন্যগোষ্ঠীরও হতে পারে। এর পর আবির্ভূত হয় খাসি-সিন্টেংরা। যদিও তারা মোঙ্গলীয়, কিন্তু অস্ট্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে থাকবে। এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় উপমহাদেশে আর্য-আগ্রাসনের ফলে তাদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে দ্রাবিড়রাও এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই দ্রাবিড়দের বসবাসের নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় রোমিলা থাপারের গবেষণায়:

> আরো পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছোট ছোট বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মানুষেরা ছিল শিকার ও কৃষিকাজের মাঝামাঝি একটা স্তরে। পাথর ও তামার তৈরি নানা জিনিসি আর গৈরিকবর্ণ নিম্নস্তরের মৃৎপাত্র এরা ব্যবহার করত। ইন্দো-আর্যেরা যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় এসে পৌঁছল, তখন তারা সম্ভবত এই মানুষগুলিরই দেখা পেয়েছিল। (থাপার, ১৯৯৩: ১০)।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে তার প্রভাব যেমন বিদ্যমান, তেমনই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও। উদাহরণ হিসেবে টাটকা ও শুকনো মৎস্যাহারে অনুরাগ, বিলাসোপকরণের সামগ্রী, জলসেচনের উন্নততর চাষের অভ্যাস, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি দ্রাবিড়ভাষাভাষী জনপ্রবাহেরই ফল (রায় ২০০৩: ৫২)। সবশেষে আসে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আর্যরা। আর্যরা এ-অঞ্চলে এসে পূর্বকার বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সাথে কোনো প্রকার বিরোধে প্রবৃত্ত হয়নি। বরং তারা একটি সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। সুনীতিকুমারের বিবেচনায়:

> পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার সর্বত্র এই আর্য জাতি স্থানীয় নিষাদ কিরাত দ্রাবিড়দের সঙ্গে অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহে বদ্ধ হতে থাকে, এদের ভাষা একটি প্রবর্ধমান মিশ্র জাতির সভ্যতার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত আর প্রাকৃতরূপে এই ভাষা সর্বত্র প্রসারিত হয়, আর শেষে মগধ হয়ে এই আর্যভাষা বাঙলা দেশে এসে বাঙলা ভাষা রূপ নিয়ে বাঙলার মিশ্র নিষাদ কিরাত দ্রাবিড় আর্যজাতির মানুষদের 'বাঙালী' বা বঙ্গভাষী বা জন রূপে গঠন ক'রে তোলে। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১: ২৯)

সিলেটের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় যে ঘটেনি তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে নাগা, গারো, মণিপুরি, চাকমা ইত্যাদি উপজাতি তাদের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে; উত্তর ভারতীয় মিশ্র আর্যগোষ্ঠীর রক্তমিশ্রণের উত্তরাধিকারও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। তাছাড়া আলপাইনীয়, শক, হুন ইত্যাদি রক্তের কিছুটা মিশ্রণও একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। পরবর্তীকালে সেমেটিক আরব, পশ্চিম এশিয়ার ইরান-তুরান, উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঠান-আফগান জাতির মিশ্রণ ও প্রভাবে এক সংকর জনতার জন্ম যেমন বাংলাদেশে, তেমনি সিলেটেও ঘটেছে একটু অধিক মাত্রায়।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে সিলেটের প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতি বেশ সমৃদ্ধ-তা তার ভাষার স্বাতন্ত্র্য, নৃতাত্ত্বিক স্বকীয়তা, আঞ্চলিক বিশেষত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই অনুমেয়। পূর্বে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন শ্রীহট্ট এলাকায় নিগ্রোবটু, নিষাদ, দ্রাবিড়, কিরাত, আর্য প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এ-অঞ্চলে বসবাস করেছে। এছাড়া এখানে মোঙ্গলয়েড জনগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্যভাবে বাসিন্দা হয়ে যেমন এক রক্তসংকর জনগোষ্ঠী তৈরিতে সহায়তা করেছে, তেমনি এদের প্রত্যেকেরই সমাজ-সংস্কৃতিই এ-অঞ্চলে লক্ষণীয়ভাবে রয়ে গেছে। এদের মধ্যে কারো কারো সমাজ-সংস্কৃতি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এখনো বিদ্যমান। কারো কারো সমাজ-সংস্কৃতির স্রোত পরস্পর মিশ্রণের ফলে নতুন অবয়ব ধারণ করেছে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা জন-বিবর্তনে বিশাল অস্ট্রিকভাষী বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত ছিল। কাল-কালান্তরে সমাজ ও ধর্মীয় বিপ্লবের পরও সেই প্রাচীন কৌম সমাজের চিহ্ন হাজার হাজার বছর পরও সিলেটের বর্তমান সমাজে টিকে আছে।[২০] সুপ্রাচীন সিলেটের অস্ট্রিক সংস্কৃতির সমাজচিন্তা ও বাস্তব জীবন এবং ইন্দো-মোঙ্গলীয় বোডোদের মানস-সংস্কৃতিতে কিছুটা পার্থক্য ছিল, কিন্তু বাস্তব সংস্কৃতিতে ততটা ছিল বলে মনে হয় না। এরা উভয়েই ছিল মূলত কৃষিজীবী; শিকার বৃত্তি ও খাদ্য সংগ্রহ ছিল তার পরিপূরক। লাঙলভিত্তিক চাষাবাদের পত্তন হয়েছিল

আর্যদের হাতে। আর্যদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত ছিল বিধায় একটা আগ্রাসনের মুখে, বলতে গেলে বাধ্য হয়েই আর্য-সংস্কৃতি অন্য অপর জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। কেউ-বা আবার আর্য-সংস্কৃতির সাথে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিলীন হতে দেয়নি। যেমন মোঙ্গলয়েড জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা আজও আর্যসংস্কৃতির তথা সমতল ভূমির লাঙলভিত্তিক চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। *জুম* জাতীয় চাষাবাদে এরা অভ্যস্ত। এখনও ওরা মাচাঙের ওপর বসতঘর তৈরি করে থাকে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কৃষিনির্ভর সিলেটের ভূমিই ছিল প্রধান উৎপাদন উপকরণ। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সিলেটের পার্থক্য এখানে যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই এখানকার ভূমি-ব্যবস্থাপনা অন্যরকম ছিল এবং ভূমিব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করেই সিলেটের সামাজিক স্তরবিন্যাস গড়ে উঠেছে। এমনকি এই ভূম্যাশ্রয়ী উঁচু-নীচু ভেদাভেদ বা জাতপাত বিচার সম্ভবত সিলেট ছাড়া অন্য কোথাও এত বেশি চোখে পড়ে না। যাই হোক, প্রাচীন সিলেটে ভূমিকেন্দ্রিক *অগ্রাহার* নামক বিশেষ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের অনুমতি ও অভিবাসন প্রক্রিয়া সে-সময়কার এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২১] এই প্রথায় ঔপনিবেশকারীদের সঙ্গে কৃষক, শ্রমজীবী (কামার, মৃৎশিল্পী, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি), পেশাজীবী (লেখক, কেরানি, কায়স্থ, ভূমি জরিপকারী ইত্যাদি) প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকও এসেছিল, যাদের হিসাব ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশকারীদের মধ্যে ধরা হয়নি (কানুনগো ১৯৯৯: ১৪১)। কালক্রমে ভূমিগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের উত্তর পুরুষ শ্রীহট্টের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। এই ব্যাপক আকার বিস্তারের ফলে কালক্রমে বৃহত্তর শ্রীহট্টে বাঙালি জাতি ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্যেই মোঙ্গলজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়েও শ্রীহট্ট জাতিগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিতে বাঙালি হয়ে উঠেছে।

ভৌগোলিক কিংবা জীবন-জীবিকার তাগিদে হোক আর ধর্মীয়-রাজনৈতিক কারণেই হোক সুপ্রাচীনকাল থেকে সিলেটে নানা জাতের, নানা বর্ণের, নানা ধর্মের মানুষের আগমন ঘটে। এর ফলে সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন আন্তঃসংঘর্ষ ঘটে, তেমনি একধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়াও ঘটে। যেমন বৈরী মনোভাবাপন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকের সমাজ ও সংস্কৃতি যতই উন্নত হোক না কেন উন্নাসিক আর্যরা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বাইরের সবাইকে হীন মনে করত। অবশ্য শত শত বছরব্যাপী আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষ ও প্রতিরোধ যুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে আপোস ও সমন্বয় ঘটে। অশোকের শাসনামলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবৈদিক আর্যসংস্কৃতির প্রসার ঘটলেও সিলেটে তা মোটেই প্রবেশ করতে পারেনি। অবশ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য উপকরণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংঘর্ষের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। লৌহকঠিন ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় অশোকের বৌদ্ধধর্মের বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটেও ক্রমে বিস্তার লাভ করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ধ্যান-ধারণা বা লৌকিক ধর্মকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা বিতাড়িত করে নয়, বরং স্বীকার করে নিয়েই দিন দিন বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং

পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম- এসব লৌকিক প্রথা খুব একটা পরিবর্তন করতে পারেনি। বরং তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবাগত ধর্মের রূপকেই পরিবর্তন করে নিয়েছে।

সেন রাজত্বের পূর্ব পর্যন্তসিলেটে পাল রাজা তথা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের স্বর্ণযুগ ছিল। মোটামুটি গুপ্ত যুগে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিস্তার ও বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়। তাই গুপ্তোত্তরকালে অর্থদানের পরিবর্তে আসে মূলত ভূমিদান এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিবর্তে গ্রহীতার জায়গায় আসেন ব্রাহ্মণ। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত সেন রাজাদের প্রাধান্য ঘটে। তারা বৌদ্ধদের বিতাড়িত করার জন্য উত্তর ভারত থেকে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করেছিলেন। রাজনৈতিকভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসেন মুসলমানরা। ইসলাম প্রচারে আরব বণিকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসে। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরব, ইরান, ইরাক, ইয়েমেন ও মধ্য এশিয়ার সুফিগণ এদেশে আসেন। সেন আমলে যখন বাংলার জনগণ বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর (শূদ্ররা) জনগোষ্ঠী সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকারহারা হয়ে ছিল অবক্ষিপ্ত, বৌদ্ধরা প্রাচীন কৌম বিশ্বাস ও তন্ত্র-মন্ত্রে ছিল আচ্ছন্ন; ব্রাহ্মণগণ হয়ে পড়েছিল নিয়তিনির্ভর- ঠিক সে সময় ইসলাম ধর্ম সাম্য-মৈত্রীর বাণী ও কর্মের আদর্শ নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন বৌদ্ধ ও শূদ্র সম্প্রদায়ে বিপুল জনগোষ্ঠী জীবনমুখী ও মানবিক ধর্ম হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করে। সামন্তশ্রেণী ও উচ্চবর্ণের অনেকে আবার ইসলাম গ্রহণ করল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য; কেননা ইসলাম ছিল তখন শাসকদের ধর্ম। বৌদ্ধদের উপর তখন নির্মম অত্যাচার চলছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধ জনগণের জীবন যখন অতিষ্ঠ তখন তারা ব্রাহ্মণ্য শাসনের পতন কামনা করেছিল (ফজলুল হক ১৯৯৪: ৬৯)। সিলেটের ক্ষেত্রে ওই একই বাস্তবতা ক্রিয়াশীল ছিল।

অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলিম আরব বণিকেরা বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও সিলেট অঞ্চলে যাতায়াত করতেন এবং এভাবে এদেশে তাদের বংশ বিস্তারও ঘটান। শাহজালালের আগমনের পর থেকেই মূলত সিলেট ইসলামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে আসে। তা সত্ত্বেও স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে তা অভিঘাত সৃষ্টি করেনি। কেননা, পারস্যের সুফী দর্শনের মধ্যে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের *সর্বপ্রাণবাদ* ও *গুরুভক্তির* একটি সাযুজ্য আবিষ্কার করে। তাই তারা ধর্মান্তরিত হলো বটে, কিন্তু সংস্কৃতি ত্যাগ করল না। চাষবাদের সময় তারা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পূর্ববৎ চালিয়ে গেল। বারুণী মেলা, রথযাত্রা, বৈশাখী মেলা প্রভৃতিতে সমান উৎসাহী থাকল। *শিরনি* মানতের মাধ্যমে নানা লৌকিক দেবতার ভাব-ভলোবাসা পুষে রাখল। ওলাবিবি, সত্যপীর, বদরপীর, পীর গোরাচাঁদ, বড় খাঁ গাজি, খোয়াজ-খিজির প্রভৃতি মুসলিম লৌকিক দেবতুল্যমানবে প্রতিস্থাপিত হলো হিন্দু লৌকিক দেবতারা। অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাদের পূর্বপুরুষ-আচরিত সংস্কার-বিশ্বাসকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারল না; পারাটা সম্ভবও ছিল না। অন্যদিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই শাহজালালের মাজার ভক্তিতে অবনত থাকত; যদিও ইসলাম ধর্মে মাজারের কোনো স্থান নেই। সে জন্যে এ-অঞ্চলে প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে নবাগত ইসলাম ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ

বিরোধ ঘটেনি। বরং স্থানীয় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। ফলে সিলেট অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের মিশ্রণে একটি মিশ্র সমাজ-সংস্কৃতির ধারা উৎসারিত হলো।

শাহজালালের পরবর্তীকালে সিলেটের সংস্কৃতি যখন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ ধরে এক নবতর অবয়ব প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময়েই শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) এবং অদ্বৈতাচার্য (১৪৩৪) নবদ্বীপে হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন। এই দুই হিন্দু সাধক হিন্দু-ধর্মের বর্ণগত বৈষম্য ও সংঘাতের বিপরীতে সৌভ্রাতৃত্বভিত্তিক বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করেন। শ্রীচৈতন্য তার ধর্মমত শ্রীহট্টসহ সারা বাংলায় প্রচার করতে থাকেন এবং অদ্বৈতাচার্যের শিক্ষা আসাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে (Rizvi 1970: 97)। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই ধর্মাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। বলতে গেলে গোটা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এই দর্শনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। শ্রীহট্টেও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সিলেটের লোকগানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, লোককবিদের রচিত এসব সৃষ্টিশীল সাহিত্য হিন্দুয়ানি ভাব ও উপমায় সমৃদ্ধ। এসব গানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক নিরন্তর ব্যবহৃত হয়েছে (মনসুরউদ্দীন ১৯৭৮: ১৩)। এখনো লোককবিদের গানে তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সিলেটে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নিয়ে গঠিত জনগোষ্ঠী নানা সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায় বা স্বকীয় জাতিতে ও বর্ণে বিভক্ত। সুদূর অতীত থেকে যে-সব পেশার লোক এখানে বসবাস করে আসছেন তারা হচ্ছেন- কৃষক, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, কামার, কুমার, কৈবর্ত, তেলি, গোয়ালা, গণক, চামার, তাঁতি, ধোপা, বারুই, ভুঁইমালী, যুগী, নাপিত, বৈদ্য, স্বর্ণকার, জেলে, মাঝি প্রভৃতি। এছাড়া সিলেটের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে-সব বংশ মর্যাদা ও পেশার লোক আছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-সৈয়দ, কোরেশী, শেখ, খোন্দকার, শাহ, মীর, পাঠান, খান, বখশ, মীর্জা, বেগ, আনসারি, দেওয়ান, চৌধুরী, কাজি, গাজি, তরফদার, তপাদার, লস্কর, জায়গীরদার, দস্তিদার, মণ্ডল, তালুকদার, মাহিমাল, জোলা, গাইন, নাগারছি, শিকারি, বেজ প্রভৃতি। কাজি, মুফতি, খোন্দকার, মীর, চৌধুরী, তালুকদার প্রভৃতি উপাধির মধ্যে কুল মর্যাদা যত নেই তার চেয়ে বেশি আছে তাদের বংশগত পেশার তথাকথিত পরিচয়। উপাধিগুলো বৃত্তিপরিচায়ক, বংশ পরিচায়ক নয়। যারা আতরাফ বলে পরিচিত তাদের মধ্যেও যে-সব পদবি দেখা যায় তাও আসলে বৃত্তিজ্ঞাপক। এসব পদবি শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয় হিন্দুদের মধ্যেও আছে।

হিন্দুদের মধ্যে জাতিভাগঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, দাস, সাহু বা সাহা, বারুই, তেলী, নাপিত, গণক ও ভাট, কৈবর্ত, কুমার, কুসিয়ারি ও রায় এবং ঢালকর, কেওয়ানি, গাড়ওয়ান, গাঁতি ময়রা, মাহারা, মালো, যুগী, নমঃশূদ্র, শাখারি, শুঁড়ি, নাথ, মালী, ডোম, পাটনি, ধোপা, কামার, সুতার প্রভৃতি। এর মধ্যে ঢালকর একেবারেই স্থানীয় এবং সাহা-রা ভারতেও দুর্লভ। ধর্মগতভাবে হিন্দুগণ শৈব শাক্ত, বামাচারী শৈব, বৈষ্ণব, কিশোরীভজন, জগন্মোহনী ও গোঁসাই শ্রেণী নামে পরিচিত। এখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে মৈথিল ব্রাহ্মণদের প্রভাব (এবং তাদের

সাংস্কৃতিক প্রভাব) সর্বাপেক্ষা অধিক। কথিত হয় এখানে আদি ১০ (দশ) গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের কারণে শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রগণের উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটে (মনিরুজ্জামান ১৯৯৪: ৩২৬)।

সিলেটে যে সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার বিশিষ্ট ও কলঙ্কজনক দিক ছিল *নানকার* প্রথা। এ-প্রথার অধীনে ভূ-স্বামীদের একশ্রেণীর প্রজা থাকত যারা নামে প্রজা হলেও কার্যত এরা ছিল এক ধরনের ভূমিদাস। মুগল আমলের সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় নানকার প্রথার উদ্ভব হয়, কিন্তু সিলেটে এর বিকাশ ঘটে কোম্পানির আমলে (চক্রবর্তী ১৯৯৩: ২২১)। উল্লেখ্য যে, ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরও সিলেটে এ-প্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে বৃহত্তর সিলেটে নানকার প্রজার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ (চার) লক্ষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-দশমাংশ (হোসেন ও মামুন ১৯৮৬: viii)। সিলেটের এই *নানকাররা প্রজা* হলেও ছিল ভিন্নবর্গের প্রজা। অন্যান্য প্রজার সাথে পার্থক্য নির্দেশের জন্য এদের ডাকা হতো নানকার প্রজা, খানেবাড়ির প্রজা, হদুয়া প্রজা, বেগার প্রজা, চাকরান প্রজা প্রভৃতি নামে। জমিদারি পরিভাষায় এদের পরিচিতি ছিল *ভাতের গোলাম*। তাছাড়া বাংলার বাইরে থেকে আগত হিন্দি বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাভাষী মুচি ও চা-বাগানের সাবেক শ্রমিক যারা জমিদারের আশ্রয়ে এসে বসবাস করতেন তারা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও তাদের সবাই নানকার পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকতেন। (ভট্টাচার্য ১৯৯৯: ২০-২১)। অবশ্য নানান আন্দোলন ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এবং ১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববাংলা জমিদারি ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল পরিষদে গৃহীত হলে সিলেটে এই মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী প্রথার বিলোপ ঘটে। তা সত্ত্বেও সিলেটের সামাজিক স্তরবিন্যাসে এ প্রথার প্রভাব ছিল মহীরুহের মতো এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। সিলেটের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে এখনো সামাজিক ভেদ-বিন্যাস প্রচলিত রয়েছে।

সিলেটে পার্বত্য জাতিদের মধ্যে কুকি, খাসি (খাসিয়া), সিন্টেং, তিপরা প্রধান। সিলেটের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুকিদের বাস ছিল। হিন্দুদের আগমনের পর তারা পার্বত্য অঞ্চলে চলে যায় (রহমান, মো.হা. ১৯৯৭: ২৪৮)। মাতৃপ্রধান অস্ট্রিক সমাজের ধারাটি এখনো খাসিয়াদের মধ্যে প্রবাহমান। এরা প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মিশনারিদের চেষ্টায় অনেকে খ্রিস্টান হলেও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।

সিলেটে মণিপুরি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক বসবাস করেন। ধর্মের দিক থেকে এরা হিন্দু-বৈষ্ণব। সিলেটে বাঙালি জাতি-সত্তার সাথে দীর্ঘ দুই শতাধিক বছর ধরে বসবাস করলেও মণিপুরিরা তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে (শেরাম ১৯৯৬: ১৭)। এছাড়া সিলেট শহরের নিকটবর্তী এলাকার একটি ছোট্ট সম্প্রদায় রয়েছে যাদের বলা হয় *পাত্র*। এদের আর্থসামাজিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। এরা চুনাপাথর, পানের ব্যবসা, কয়লা ও ছাই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে (চক্রবর্তী, ২০০০: ৬৬)। সিলেটে আরেকটি সম্প্রদায় হচ্ছে বারুজীবী। এরা পান উৎপাদন ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

সিলেট অঞ্চলের শেখ ও মৎসজীবীদের আলাদা আলাদা সমাজ। এখানকার মুসলমান মৎসজীবীরা স্বতন্ত্র জাতিরূপে বিবেচিত হন। শেখদের সঙ্গে তাদের বিয়ে বা সামাজিক সম্বন্ধ

সাধারণত হয় না। অন্যদিকে যারা মাটি কাটে, পান বিক্রি করে, পশুর চামড়া ছাড়ায় এবং চামড়ার ব্যবসা করে তাদের আতরাফ শ্রেণীর লোক বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া সিলেটে চা বাগানের কুলি হিসেবে ভারতের উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত- একটি বিরাট গোষ্ঠী এ-অঞ্চলে এসে এখানকার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে (Rizvi 1970: 136)।

হজরত শাহজালাল ও ৩৬০ আউলিয়া ছাড়াও আরো অনেক তুর্কি, আফগান, আরবীয় লোক এ অঞ্চলে এসে বসবাস করে এবং এখানকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফলে শাসকদের পাশাপাশি লোকজীবনে এদের অনেক সামাজিক আচার এবং আপন ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চলের তুলনামূলক অনগ্রসরতার পটভূমি যেমন বিস্তৃত, তেমনি তার কারণও অনেক। যে সামাজিক প্রক্রিয়ায় সমাজ-সংগঠনে চিন্তা ও কর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সিলেটে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় ঘটেনি। প্রথমাবধি বহিরাগত অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী স্থানীয় জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের চিন্তার চেয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার ব্যাপার অতিমাত্রায় ব্যাপৃত ছিল বলে মনে হয় (মোহান্ত ১৯৯৭: ২৮০-৮১)। এ-অঞ্চলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার পুরো অঞ্চলটিকে দ্রুত গ্রাস করে নিয়েছিল ইতঃপূর্বে। মুসলিম আমলে রাজভাষা হিসেবে *ফারসি* সংস্কৃতের স্থলাভিষিক্ত হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে আরবি-ফারসির চর্চা বেড়ে যায়। স্থানে স্থানে মাদ্রাসা ও মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ফারসি চর্চায় এগিয়ে আসেন বৈষয়িক কারণে। একদিন সংস্কৃতের পরিবর্তে ফারসি রাজভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল; এবার ইংরেজি সেই স্থান অধিকার করল। কিন্তু সেদিনকার কলকাতাকেন্দ্রিক সমাজের আধুনিক শিক্ষা চিন্তার অভিঘাত-সুদূর সিলেট পর্যন্তপৌঁছাতে কিছুটা অতিরিক্ত সময় লেগেছিল বলা যায়। আর নারীরা স্কুল শিক্ষায় এগিয়ে এসেছিল আরো অনেক পরে।

সিলেটের সমাজ-সংস্কৃতিতে ভাষিক বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এ-কারণে যে, সিলেটি আঞ্চলিক ভাষার লক্ষণসমূহ ও চারিত্র্য বাংলার অপরাপর অঞ্চল থেকে পৃথক। সিলেটি উপভাষাকে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষা বলে অবহেলা করার কোনো কারণ নেই। ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক খণ্ডিত সিলেটের উভয় অংশে প্রায় দেড় কোটি লোক এ-উপভাষায় কথা বলে। সিলেটের উপভাষী হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট-সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার এবং আসামের করিমগঞ্জ ও কাছাড়ের কিছু অঞ্চলকে ভাষিক সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে আওতাভুক্ত করা হয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কারণেই। অন্যদিকে সিলেটি উপভাষা প্রসঙ্গে *সিলেটি নাগরীর* কথা উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতদের ধারণা, ষোড়শ শতকের শেষার্ধে *সিলেটি নাগরী* নামে মুসলমানদের হাতে এই স্বতন্ত্র বর্ণমালার প্রচলন হয় এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিবদমান একটি জনগোষ্ঠীর স্থানীয় একত্রীকরণের প্রধান মাধ্যম হিসেবে লিপিটির উদ্ভব ঘটে (কাদির ১৯৯৯: দশ)।[২২] কিন্তু যে-ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায়ই এ-ধরনের লিপির উদ্ভব হয়ে থাক না কেনো, তা যে *সিলেটি মুসলমানদের কথ্যভাষারই লেখ্যরূপ* তা সর্বতোসত্য বলে পরিগণিত।

প্রথম দিকে মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় ও স্বতন্ত্র লিপিমালা হিসেবে গৃহীত হলেও এক সময় তা তাদের দৈনন্দিন লিপি হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করে। এ-লিপির মাধ্যমে একসময় পুঁথিসাহিত্য রচিত হতো। দোভাষী পুঁথির সঙ্গে সিলেটি নাগরী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সতেরো-আঠারো শতক এর বিকাশকাল। সিলেটি নাগরী সাহিত্য পল্লী অঞ্চলের লোকদের সাহিত্য-ক্ষুধা নিবারণ করেছে। মুন্সী সাদেক আলীকৃত *হালতুন্নবী* পুঁথির দু-চারটি লাইন ঠোঁটস্থ নেই এমন প্রাচীন-প্রাচীনা সিলেটি খুঁজে বের করা ভার।

সুপ্রাচীনকাল থেকে পল্লীগান, জারি, সারি, বাউল, ভাটিয়ালি, মারফতি, মুর্শিদি, যাত্রা, রাজার গীত, ঘাটু[২৩], মালজোড়া, ধামাইল[২৪], বিয়ের গান বা মেয়েলী গীত, মণিপুরি নৃত্য প্রভৃতিতে সিলেট সমৃদ্ধ। হাসন রাজা সিলেটের সুনামগঞ্জ এলাকার একজন প্রখ্যাত মরমি কবি; তাঁর আধ্যাত্মিক গানের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও বক্তৃতায় এবং লেখনিতে উল্লেখ করেছেন। ময়মনসিংহ গীতিকা নামে দীনেশচন্দ্র সেন যে কতগুলো গীতিকা সংকলন করেছেন- এগুলোর বেশির ভাগই শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলের সম্পদ। এ-প্রসঙ্গে *সিলেট গীতিকার*[২৫] নাম উল্লেখ করা যায়-সিলেটের লোককবিদের দ্বারা রচিত এসব গীতিকায় সমকালীন সিলেটের লোকমানস, জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধারমন দত্ত, দীন ভবানন্দ, আরকুম শাহ, শীতালং শাহ, শখ ভানু, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ সিলেটের উল্লেখযোগ্য লোককবি, যাঁদের গান লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। ঘাটু গান ও ধামাইল নৃত্য সিলেটের বিশিষ্ট এবং একান্ত সম্পদ। এছাড়া সিলেটের লোকাচার, পই (ধাঁধাঁ), ছিলক (শিল্লক < শ্লোক), ডিটান, ডাকের কথা, প্রবাদ, লোকছড়া প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যিক ধারা এতদঞ্চলের সংস্কৃতির অন্যতম পরিচায়ক। শুধু তাই নয় অন্যান্য সমাজের মতো সিলেটের সমাজেও, এই মাটিই থেকে উদ্গত বিশিষ্ট কিছু লোকাচার, এবং লোকবিশ্বাস আজও প্রায় ধর্মবিশ্বাসের মতো মানুষের মর্মমূলে গেঁথে আছে।

সিলেটের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত এবং সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পাহাড়-টিলা, নদ-নদী, হাওর-বিল, বনজঙ্গল, সমতলভূমি, নবীন ও প্রবীণ ভূ-ভাগ এবং জলবায়ুগতভাবে বহুল বৃষ্টিপাত-এমনতর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য নিয়েই সিলেটের অস্তিত্ব। সিলেটে সুপ্রাচীনকাল থেকে জনবসতি ও জনঅভিবাসনসহ অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনও বহুলাংশে এই ভূগোল দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে। এবং বিচিত্র-বিপুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে জীবনের হাতছানির প্রথম অভিযাত্রী আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরাই। তার পরে একে একে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবে এখানে যে রক্তসংকর জনতার স্রোত তৈরি হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক জীবন, ধর্ম, বিশ্বাস-সংস্কার তথা সমাজ-সংস্কৃতির পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মিথস্ক্রিয়ায় নতুন অবয়ব ধারণ করে বর্তমান কালের মানুষ পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে কালান্তরে জনমানুষের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, প্রযুক্তির ব্যবহার, বহির্বিশ্বের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ সিলেটের সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাহলেও, সুরমা (অংশত বরাক) উপত্যকার জনতাত্ত্বিক সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সূত্রে গাঁথা এবং তার

বহমান ধারাটিও ক্ষীণ নয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এ-জনপদের মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যে ও উজ্জ্বলতায় ভাস্বর।

টীকা

১। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিলেট এলাকা হিমালয়ের ভঙ্গিল পর্বতের সক্রিয় মহীগঠন অংশে অবস্থিত হয়ার কারণে ধারণা করা হয় খাসিয়া-জৈয়িন্তা পাহাড়ের উত্থানের ফলাফলের সাথে নিম্ন অববাহিকা এলাকার গঠন সম্পর্কিত (Morgan and Mclntire ১৯৫৯: ৩৪২)।

২। কেননা এ-সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বস্তুত প্রাচীন সিলেটের ঐতিহাসিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসন, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের নিদর্শন ও বিদেশি পর্যটক-লেখকদের দেওয়া যৎসামান্য তথ্য ও ইঙ্গিত।

৩। গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বতন রাজ্য ছিল কামরূপ। মহাসেন গুপ্ত নামক জনৈক গুপ্ত নরপতি (আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর চতুর্থপাদ) কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মাকে পরাজিত করলে অনুমান করা যায় কামরূপরাজগণ গুপ্ত আধিপত্য স্বীকার করেন অথবা তাদের সামন্ত হন। (রায় ২০০৩: ৩৬০)

৪। তাম্রশাসনটি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত। লিপিতত্ত্ব বিচারে একে নবম শতাব্দীর বিবেচনা করা হয়। (রহিম ও অন্যান্য ১৯৭৭: ৮১-৮২)

৫। কিন্তু এর সীমানা নির্দিষ্ট হয়নি। অপর ভৌগোলিক নামের খণ্ড-রাজ্যের মতোই হরিকেল রাজ্যের সীমাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। (চৌধুরী, মুশ্‌কিম ১৯৯৭: ৩৬-৩৭)

৬। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সপ্তম শতাব্দীতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল দশম শতাব্দীতে শ্রীচন্দ্রের শাসনকালে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৭। শ্রীচন্দ্রের পর দীর্ঘদিন চন্দ্রবংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে পরপর বৈদেশিক আক্রমণে চন্দ্ররাজ্য দুর্বল হয়ে এই বংশের পতন ঘটে।

৮। এ-প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক: "ইতিহাসে শ্রীহট্টকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করার এটাই একমাত্র নজির অর্থাৎ ঐ সময়ে মহারাজ শ্রীচন্দ্রের লিপিতে যাকে বলা হয়েছে শ্রীহট্ট মণ্ডল, তা একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। (মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ১৯৮৩: ৪)। কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন দীনেশচন্দ্র সরকার। তাঁর মতে: 'হরিকেল মূলত শ্রীহট্টের নাম এবং শ্রীহট্টরাজ্যের বঙ্গে বিস্তৃতির ফলে পরবর্তীকালে ওটি বঙ্গেরও নামরূপে ব্যবহৃত হতো (সরকার ১৯৮২: ১০৬)।

৯। প্রাথমিক তুর্কি সুলতানদের শাসন ব্যবস্থায় তাঁরা রাজ্যকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করতেন। যেমন- *ইকতা* এবং ইকতার শাসনকর্তা ছিলেন *মুকতা*। (চৌধুরী, মুস্তাকিম ১৯৯৭: ৪৬)

১০। তখন সিলেটের ইংরেজ শাসনকর্তার পদবি ছিল কালেক্টর। স্থানীয় প্রশাসনের উপর তখনও অতিরিক্ত চাপ যাচ্ছিল। রতনলাল চক্রবর্তীর মতে, বিদ্রোহী সিপাহিদের সাথে যুদ্ধ, যুদ্ধবন্দিদের বিচার, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের মনোভাবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টিদান প্রভৃতি অবস্থাও ছিল সিলেটে এ-সময়কার উল্লেখযোগ্য বিষয় (চক্রবর্তী, র. লা. ১৯৯৯: ১৬৩)।

১১। মুহম্মদ আসাদ্দর আলী তার *চর্যাপদে সিলেটি ভাষা* (১৯৯৩) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন *চর্যাপদ* সিলেটি উপভাষাতেই লিখিত হয়েছে। তিনি প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছেন চর্যার কবিদের জন্মস্থান, স্থাননাম; চর্যায় বর্ণিত পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান। গবেষকের এই গবেষণা হয়তো বিতর্কের বিষয় তবে এটাও ঠিক যে চর্যার অনেক শব্দ, বাক্যবন্ধ ও প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি সিলেটি উপভাষার নিজস্ব সম্পদ।

১২। আধুনিককালে রিজলি, রামপ্রসাদ চন্দ, বিরজাশঙ্কর গুহ প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকরা বাঙালির শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার বিশেল্ষণ করেছেন এবং করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট কিংবা চোখ-চুল-চামড়া এ সব তাদের পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের *সাংকর্য* কারুর কোনো লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি। তাই বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সমস্যা রয়েই গেছে। ভারতীয় জনতত্ত্বে প্রাক্-আর্য বঙ্গবাসীদের স্থান কোথায়, অর্থাৎ প্রাচীন বঙ্গবাসীরা কোন নৃ গোষ্ঠীর অন্তর্গত তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।

১৩। স্যার হারবার্ট রিজলি ছিলেন ব্রিটিশ-ভারতের বিখ্যাত সিভিলিয়ান, বঙ্গভঙ্গের হোতা লর্ড কার্জনের সমসাময়িক এবং অ্যানড্রু ফ্রেজারের বন্ধু। তবে তাঁর প্রকৃত খ্যাতি সেনসাসের তৎকালীন অধিকর্তা হিসেবে এবং তাঁর *Tribes and castes of Bengal* নামের বইটির জন্য। [Herbert Risely, *Tribes and castes of Bengal, Vol.1, II, Calcutta 1891]*.

১৪। শ্রীহট্ট কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস, সুজিৎ চৌধুরী, ১৯৯২, কলকাতা: প্যাপিরাস, পৃষ্ঠা, ১০।

১৫। আফ্রিকা থেকে আগত নিগ্রোরা অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর চাপে জীবিকার অন্বেষণে আসামের পাহাড়ে এসে থাকলে এরা সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলেও বসবাস করেছিল বলে অনুমান কার যায়। বাঙলায় এরা আর বসবাস করতে না পারায় আসাম অঞ্চলকেই তাদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। (মনি, ১৯৯৭: ২৮৭)

১৬। *KIRATA-JANA-KRTI: THE INDO-MONGOLOIDS, THEIR CONTRIBUTION TO THE HISTORY AND CULTURE OF OF INDIA,* 1974. Calcutta: The Asiatic Society.

১৭। দ্রষ্টব্য: পাল ২০০১: ৮১। রহমান ১৯৯৭: ২৪৮। সিংহ ১৯৯৪: ১৭০।

১৮। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাইজগাঁও এবং বরমচাল রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী ভাটেরা নামক স্থানের হোমেরটিলার নিকটবর্তী ইটের ঢিবিতে দুইখানি তাম্রশাসন একত্রে, একসঙ্গে আবিষ্কৃত হয়। প্রথম তাম্রশাসনটি শ্রীহট্টের রাজা গোবিন্দকেশবদেবের (খ্রি. ১১শ শতাব্দী) ও দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি তৎপুত্র ঈশানদেবের (খ্রি. ১১শ-১২শ শতাব্দী)। (গুপ্ত ১৯৯৭: ১৯)

১৯। দ্রষ্টব্য: *KIRATA-JANA-KRTI*|

২০। সেখানে একেকটি জায়গায় ছিল আদিবাসী কৌমের আস্তানা। এক কৌমের সঙ্গে আরেক কৌমের মুখ দেখাদেখি ছিল না। নিজেদের চারপাশে তারা গড়ে তুলেছিল নানা বিধি-নিষেধের দেয়াল। যার যার গণ্ডিটুকুর মধ্যে শুধু তারা নিজেদের নিয়ে নিজেরা থাকতো (মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ১৯৮৩: ১৯৪)। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা স্বীকৃত হলেও ইসলাম ধর্মে তা যদিও স্বীকৃত ছিল না, কিন্তু মুসলিম সমাজে সামাজিক মেলামেশা ও বিয়ে-শাদি ইত্যাদি ব্যাপারে সিলেটের মুসলমান মৎস্যজীবী ও অন্যান্য মুসলমানের মধ্যে মেলামেশার এক অদৃশ্য দেয়াল সেই প্রাচীন কৌম চেতনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২১। নিধনপুর ও ভাটেরার তাম্রশাসন-এর প্রকৃষ্ট দলিল শ্রীহট্টে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকারে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপিত হয় মহারাজ শ্রীচন্দ্রের রাজত্বকালে। ধারণা করা হয় সুরমা কুশিয়ারার *দোয়াব* অঞ্চলেই ভূমিগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের বৃহদাকারে উপনিবেশ গড়ে উঠে। শুধু শ্রীচন্দ্রের শাসনামলেই নয়, লোকনাথ, ভাস্কর বর্মন প্রমুখ শাসক ছাড়াও অন্যান্য শাসকের আমলে বাঙালি অভিবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। এ সব তাম্রশাসন পাঠে মনে হয় যে, প্রধানত দক্ষিণ শ্রীহট্ট ও মৌলভীবাজার জেলাতেই ব্যাপক আকারে ঔপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়া চলেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তাম্রশাসনসমূহে কেবল পরিবার প্রধানদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। যদি ঔপনিবেশকারীদের পরিবারের সকল সদস্যের হিসাব ধরা হয় তবে সংখ্যা বহুগুণ ছিল (কানুনগো ১৯৯৯: ১৪১)।

২২। *সিলেটি নাগরী লিপি*র উদ্ভব নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে, মুসলিম বিজয়ের আগে সিলেট অঞ্চলে *দেবনাগরী লিপি*র প্রচলন ছিল। মুসলমানরা পরবর্তীকালে সে লিপি গ্রহণ করে ধর্মীয় প্রচার ও দেশীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। এ মতের অনুসারীদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন মুসলমানরা এ-লিপি সিলেটে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে সে লিপি *সিলেট নাগরী* নামে প্রচারিত হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, মুনশি আশরাফ হোসেন প্রমুখ এই মতের প্রবক্তক। আহমদ হাসান দানী মনে করেন সিলেটে আফগান উপনিবেশ এবং আফগান মুদ্রায় উৎকীর্ণ নাগরী লিপি সিলেটে এই লিপি বিকাশের কারণ (কাদির ১৯৯৯: ৩৮)। নাগরী বর্ণমালায় কোনো যুক্তাক্ষর নেই, সর্বমোট বর্ণের সংখ্যা ৩২।

২৩। *ঘাটু গান* বলে এক ধরনের গান সিলেটে প্রচলিত আছে। ঘাটু হিসেবে অল্প বয়সের কিশোরদের ব্যবহার করা হয়। এই গান প্রথমে কিছুটা বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবাধীন ছিল। পরবর্তীকালে তা ধর্ম নিরপেক্ষ আকার ধারণ করে মৌল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সুন্দর বালকদের নাচিয়ে আনন্দ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং আরও পরে তা অপকর্মের দিকে ধাবিত হয়ে বর্তমানে তা লোক-নিন্দিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সিলেটের আজমিরিগঞ্জের জনৈক আচার্য ঘাটু গানের প্রর্বতন করেছিলেন বলে জানা যায় (জন্নার ১৯৭০: ১১৪)।

২৪। সিলেট অঞ্চলের (বিশেষত ভাটি অঞ্চলের) এক ধরনের লোকগান বিশেষ। নৃত্যসহযোগে সাধারণত তা গাওয়া হয়। গ্রামীণ নারীরা বৃত্তাকারে দলীয়ভাবে এধরনের গান নেচে নেচে গান। কখনো কখনো বৃত্তের মাঝখানে মূল গায়িকা অবস্থান করে গান জুড়ে দেন, বাদ-বাকিরা এতে কণ্ঠ মেলান। সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে রাতের বেলা এ ধরনের গান পরিবেশন করা হয়। রাধারমণ দত্ত, শাহ আবদুল করিম প্রমুখ অসংখ্য লোককবি ধামাইল গান রচনা করেছেন।

২৫। *সিলেট গীতিকা* সিলেট তথা বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। লোকসাহিত্য গবেষক আসাদ্দর আলীর মতে, অন্তত চৌদ্দ শতক থেকে এসব গীতিকা রচিত হয়েছে সিলেটে। কালের বিবর্তনে এবং এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সবগুলোর নাম বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। বহু গীতিকা হারিয়ে গেছে চিরতরে। বাংলা একাডেমী থেকে বদিউজ্জামান সম্পাদিত *সিলেট গীতিকা* (১ম খণ্ড) প্রকাশিত (১৯৬৮) হলে তা নাগরিক-সাহিত্যবোদ্ধাদের নজর কাড়ে।

তথ্যপঞ্জী

আজিজ, মো. আবদুল। ২০০৬। 'ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (২য় খণ্ড)। সম্পা: মো. আবদুল আজিজ ও অন্যান্য। সিলেট: বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস প্রণয়ন পরিষদ।

আলম, শামসুল। ১৯৯৯। 'সিলেটের পরিবর্তনশীল ভৌগোলিক পরিবেশ'। *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। সম্পা: শরীফ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.)। ১৯৯৩ ক। *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

-১৯৯৩ খ। *বাংলাদেশের ইতিহাস* (২য় খণ্ড)। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি।

করিম, আবদুল। ১৯৯৩। *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

কাদির, এস. এম. গোলাম। ১৯৯৯। *সিলেটি নাগরী লিপি: ভাষা ও সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ। ১৯৯৯। 'প্রাচীন শ্রীহট্ট'। *সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। সম্পা: শরীফ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।

গুপ্ত, কমলাকান্ত। ১৯৯৭। 'শ্রীহট্টে প্রাপ্ত তাম্র শাসনাবলী'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পা: আবদুল আজিজ। সিলেট: বৃহত্তর সিলেট প্রণয়ন পরিষদ।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। ১৯৯১। *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

চৌধুরী, মুস্তাকিম আহমদ। ১৯৯৭। 'সিলেটের রাজনৈতিক ইতিহাসঃ প্রাচীনকাল থেকে ১৮৫৭'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পাঃ আবদুল আজিজ ও অন্যান্য। সিলেটঃ বৃহত্তর সিলেট প্রণয়ন পরিষদ।

চৌধুরী, সুজিৎ। ১৯৯২। *শ্রীহট্ট-কাছাড়ের প্রাচীন ইতিহাস*। কলকাতাঃ প্যাপিরাস।

চক্রবর্তী, রতন লাল। ১৯৯৩। 'প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ'। *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পা.: সিরাজুল ইসলাম। ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি

– ১৯৯৯। 'সিপাহি যুদ্ধকালীন সিলেট'। *সিলেটঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।

-২০০০। *সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*। ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স।

থাপার, রোমিলা। ভারত বর্ষের ইতিহাস। অনুঃ কৃষ্ণা গুপ্ত। কলকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান।

পাওনাকার, সীমা। ১৯৯৯। 'সিলেটের প্রাগ্-ইতিহাসঃ একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন'। *সিলেটঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য*। সম্পাঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি।

পাল, অনিমেষ কান্তি। ২০০১। 'বাংলার সাংস্কৃতিক এবং ঔপভাষিক ভূগোল'। *বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান*। সম্পাঃ শ্রীসনৎকুমার মিত্র। কলকাতাঃ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ।

ফজলুল হক, আবুল কাসেম। ১৯৯৪। 'বাঙালী জাতি'। *বাংলাদেশ*। মনসুর মুসা (সম্পা.)। ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

ভট্টাচার্য, অজয়। ১৯৯৯। *নানকার বিদ্রোহ* (অখণ্ডসংস্করণ)। ঢাকা।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। ২০০০। *বাঙালির ভাষা*। কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স।

মনি, নুরুজ্জামান। ১৯৯৭। 'সিলেটের লোকমানস ও সংস্কৃতি'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পাঃ আবদুল আজিজ ও অন্যান্য। সিলেটঃ বৃহত্তর সিলেট প্রণয়ন পরিষদ।

মনসুরউদ্দীন, মুহম্মদ। ১৯৭৮। *হারামণিঃ* ৭ম খণ্ড। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

মনিরুজ্জামান। ১৯৯৪। *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। ১৯৮৩। *বাঙ্গালীর ইতিহাস*। কলকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স।

মোহান্তরসময়। ১৯৯৩। 'সিলেটের শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গন'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পাঃ আবদুল আজিজ ও অন্যান্য। সিলেট বৃহত্তর সিলেট প্রণয়ন পরিষদ।

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর। ১৯৯৭। 'সিলেটের সামাজিক ইতিহাস'। *বৃহত্তর সিলেটের ইতিহাস* (১ম খণ্ড)। সম্পাঃ আবদুল আজিজ ও অন্যান্য। সিলেটঃ বৃহত্তর সিলেট প্রণয়ন পরিষদ।

রহিম, মুহম্মদ আব্দুর ও অন্যান্য। ১৯৭৭। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদি পর্ব)। ২০০৩। কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং।

শরীফ, আহমদ। ২০০৪। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড)। ঢাকাঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

শেরাম, এ. কে.। ১৯৯৬। *বাংলাদেশের মণিপুরীঃ ত্রয়ী সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে*। ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী।

সরকার, দীনেশচন্দ্র। ১৯৮২। *পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত*। কলিকাতা।

সিংহ, অনিল কিষণ। ১৯৯৪। 'সিলেটের মণিপুরি সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা'। *জেলা পরিক্রমা সিলেট*। সম্পা. জিল্লুর রহমান খান। সিলেটঃ জেলা তথ্য অফিস।

হোসেন ও মামুন, সৈয়দ আনোয়ার ও মুনতাসীর। ১৯৮৬। *বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*। ঢাকাঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

Chatterji, S. 1974. *KIRATA-JANA-KRTI: The Indo-Mongoloids, their Contribution to the History and Culture of India.* Calcutta: The Asiatic Society.

Morgan and McIntire, J.P, W.G. 1959. Quaternary Geology of the Bangal Basin, East-Pakistan & India. In *Bulletin of the Geological Society of America.* Vol. 70.

Risely, H. 1891. *Tribes and castes of Bengal, Vol.1, II,* Calcutta.

Rizvi, S. N. H. 1970. *East Pakistan District Gazetters. Sylhet.* Dacca: East Pakistan Government Press.